অনিয়মের আখড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কী আইনের ঊর্ধ্বে

| ঢাকা , রোববার, ১৪ এপ্রিল ২০১৯

বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতি বছরই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) জমা দেয়ার বিধান রয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে। কিন্তু অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই এ আইন মেনে চলছে না। শুধু তা-ই নয়, প্রতিষ্ঠার পর থেকে একবারও নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেয়নি এমন বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে বেশ কয়েকটি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ভর্তি বাণিজ্য, সাধারণ তহবিল থেকে নামে-বেনামে সিটিং অ্যালাউন্সের নামে মোটা অংকের আর্থিক সুবিধা গ্রহণ, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফি ও বেতন বাবদ আয় করা অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি সদস্যরাও এসব অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত। আর এসব অনিয়ম ঢাকতেই আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা প্রতিবেদন ইউজিসিতে জমা দিচ্ছে না বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

উল্লিখিত চিত্রে যা দৃশ্যমান হলো তা রীতিমতো উদ্বেগজনক। বলাবাহুল্য, আইন অনুসারে

বেসরকার বিশ্বাবদ্যালয় অলাভজনক প্রাতষ্ঠান হলেও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার নামে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এমনকি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সনদ বিক্রির অভিযোগও রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একের পর এক অনিয়ম করলেও সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় না। ইউজিসির দেখভাল করার কথা থাকলেও তারা এ ক্ষেত্রে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হয়েছে। আইন অমান্যকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে যত গর্জন ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের, বাস্তবে সেরূপ বর্ষণ হয়নি। যারা নিয়ম ভঙ্গ করছে, তারা বছরের পর বছর পার পেয়ে যাচ্ছে। অনুমোদন বাতিল, নতুন ভর্তি বন্ধের হুঙ্কার ছুড়ছে মন্ত্রণালয়। কিন্তু বাস্তবে এর প্রতিফলন দেখা যায় না। বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৪৫(২) ধারায় বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত অডিট ফার্ম দিয়ে প্রতি অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করাতে হবে। প্রতিবেদন-পরবর্তী আর্থিক বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে। এ নির্দেশনা লঙ্ঘন করলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাতিলের নির্দেশনা আছে। আইনের ৪৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী ৫ বছরের কারাদ- বা ১০ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দ-ের বিধান রয়েছে। আইনের ১৪, ২৫ ও ২৬ ধারা অনুযায়ী অর্থ কমিটি গঠন ও

পারচালনা করার কথা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অর্থ কমিটির কোন সভা করে না। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করেনি। প্রশ্ন হলো, এত অনিয়ম করার পরও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছেন কি করে? কোন জাদুর শক্তিবলে তাদের বিরুদ্ধে কোন তদন্ত হচ্ছে না, কোন বিচার হচ্ছে না?

সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে প্রভাবশালী হলেই যদি সব অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হয় তবে দেশে আইনকানুন, বিধি-বিধান কিংবা বিচার ব্যবস্থা থাকার দরকার কি? সব বন্ধ করে লুটেরাদের রাজত্ব কায়েম করলেই হয়, যেখানে অর্থ আত্মসাৎ এবং লুটপাট করাটাই বৈধতা পাবে, ন্যায়-অন্যায় বোধ বলে কিছুই আর থাকবে না।

উচ্চশিক্ষার প্রসার এবং মানবৃদ্ধির লক্ষ্যে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম, সে বিশ্ববিদ্যালয় যদি অনৈতিক ব্যবসার আখড়ায় পরিণত হয় তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা মনে করি, এখনও হয়তো সময় আছে, এসব অসঙ্গতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর। রাষ্ট্রযন্ত্রকে এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, দেশটা ১৬ কোটি সাধারণ মানুষের, কিছু স্বার্থান্বেষী সুযোগসন্ধানীর নয়। এটাও মনে রাখতে হবে যে, কোন মহল বা গোষ্ঠী যদি নিজেদের আইনের ঊর্ধ্বে মনে করে তবে বিচারহীনতার সংস্কৃতিই শক্তিশালী হবে। কাজেই জনগণের কথা মাথায় রেখেই আইনানুগ পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে সরকারকে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা,

জবাবাদাহিতা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির শেকড় উপড়ে ফেলতে হবে। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অনিয়মকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। সেই সঙ্গে ইউজিসিকেও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।